একক ৩ ❐ চৈতন্যচরিতামৃত

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ চৈতন্যচরিতামৃত-এর গঠন

৩.২.১ আদিলীলা (৪র্থ) ও মধ্যলীলা (৮ম) পরিচ্ছেদের অংশ

৩.৩ মধ্যলীলা (৮ম পরিচ্ছেদ)

৩.৪ সাধ্যসাধন তত্ত্ব

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের 'চৈতন্যাবদান' শীর্ষক আলোচনায় লিখেছিলেন, 'তবুও একথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে চৈতন্যাবদান রচনার পূর্বে সমসাময়িক ইতিহাসের কথা দূরে থাক, অতীত ইতিহাসেরও কোনো উপাদান মুখ্যভাবে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লাগানো হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই এক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইল।[১] শ্রীসেনের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজ প্রভাব পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে জীবনীকাব্যগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তবে এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে এইসব জীবনীকাব্যের রচয়িতারা কেউই প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করতে চাননি, ভক্তদের জন্য অবতারজীবনের নানা বৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন। অবশ্য চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) যেহেতু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সেহেতু কাব্যে তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও ঐতিহাসিক স্বরূপ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। পরে মঙ্গালকাব্যে ও অনুবাদকাব্যে যে ইতিহাস চেতনার অভাব লক্ষ করা যায় জীবনীকাব্যে তার তুলনায় স্থান-কাল-পাত্রের অধিকতর পার্থিব পরিচয় পাওয়া সম্ভব। যেহেতু ইংরেজ প্রভাব পূর্ববর্তী পর্বে আমাদের দেশে ইতিহাসের উপাদান সুপ্রচুর নয় সেহেতু চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলির মধ্যে ইতিহাসের নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আবার একথাও সত্য এই জীবনীকাব্যগুলি বিশেষ ভক্তিতত্ত্বের প্রকাশক। সুতরাং সেই ভক্তিতত্ত্বের পরিমণ্ডলটিও কাব্যপাঠ করলে জানা সম্ভব। সুতরাং চৈতন্য জীবনীকাব্য পাঠের উদ্দেশ্য হল ঐতিহাসিক উপাদানের অনুসন্ধান ও ভক্তিতত্ত্বের দার্শনিক বোঝাপড়া। অবশ্য এই দুই উদ্দেশ্যই পরিপূরক।

৩.১ প্রস্তাবনা

চৈতন্য জীবনীসাহিত্য পাঠের আগে চৈতন্য জীবনকথা খুব সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। চৈতন্যদেব

১. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ।*

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। চৈতন্যদেব শৈশবে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কাছে দেহকান্তির জন্য গৌরাঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী নাম রেখেছিলেন নিমাই। পরে দাদা বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে নাম দেওয়া হয় বিশ্বম্ভর।

চৈতন্যদেবের জীবনকে আমরা দুই পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথমটি নবদ্বীপ পর্ব অন্যটি নীলাচল পর্ব। নবদ্বীপ পর্বে চৈতন্য দুরন্ত ব্রাহ্মণ বালক। ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পণ্ডিত। অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের দেহাবসান হয়। পনেরো বছর বয়সে চৈতন্যদেব স্বনির্বাচিত পাত্রী লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি পূর্ববঙ্গে যান। তাঁর অনুপস্থিতি-পর্বে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। ফিরে এসে পত্নীশোকাহত চৈতন্যদেব ভক্তিঅনুশীলনে রত হন। এই পর্বে রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অবশ্য এই দ্বিতীয় বিবাহের পর ভক্তিমার্গ থেকে তাঁর মন গার্হস্থ্যমার্গে ফিরে আসেনি। সংকীর্তনাচার নিয়মিত চলত। এই পর্বেই কাজির সঙ্গে নামসংকীর্তনকারীদের দ্বন্দ্ব হয়। চৈতন্যদেবকে ঘিরে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রমুখরা নবদ্বীপেই এক বৈষ্ণবভক্তির বাতাবরণ তৈরি করেন।

এর কিছুদিন পরে চৈতন্য সহচরদের নিয়ে গয়ায় পিতৃকৃত্য করতে যান। গয়ায় মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তিনি মিলিত হন। পরে ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেন। আনুমানিক ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নেন। গৃহত্যাগ করে এরপর তিনি পুরীতে বসবাস করেন। নীলাচলে চৈতন্যদেবকে ঘিরে আর এক ভক্ত পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। নীলাচল পর্বে তিনি দীর্ঘ তীর্থপথ ভ্রমণ করেন। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তিনি সেখানকার ভক্তিমার্গের সংস্পর্শে আসেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি ভাববিহ্বল দশায় কাটান। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিরোভাব ঘটে।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় [২] চৈতন্যদেবের জীবনের মুখ্য কালক্রমে নির্দিষ্ট করেছেন। নীচে উদ্ধার করা হল।

জন্ম : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৪৮৬
প্রথম বিবাহ : ১৫০১-১৫০২
দ্বিতীয় বিবাহ : ১৫০৭
বৈষ্ণবীয় ভাবের উন্মেষ : ১৫০৯
সন্ন্যাস : ২৫-২৬ জানুয়ারি, ১৫১০
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ : এপ্রিল ১৫১০-এ শুরু
পুরীতে প্রত্যাগমন : ১৫১২
বৃন্দাবনে গমন : ১৫১৫
এলাহাবাদে আগমন : জানুয়ারি, ১৫১৬
বারাণসীতে আগমন : ১৫১৬
পুরীতে প্রত্যাগমন : মে, ১৫১৬
তিরোধান : ২৯ জুন, ১৫৩৩

চৈতন্যদেবকে ঘিরে নানা তত্ত্ব গড়ে উঠলেও চৈতন্যদেব যে আদতে সহজ ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন তা তাঁর নামে প্রচলিত 'অষ্ট শিক্ষা শ্লোক' (শিক্ষাষ্টক) পাঠ করলে বোঝা যায়। তাঁর ভক্তিধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য আমরা তিনটি শ্লোক উদ্ধার করব।

---

২. *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তথ্য ও কালক্রম, সুখময় মুখোপাধ্যায়,* জি. ভট্টাচার্য এ্যান্ড কোং।

১. তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ।।

(এই শ্লোকটিতে প্রকৃত বৈষ্ণবের গুণাবলী বিধৃত হয়েছে। তৃণ থেকে নীচু অর্থাৎ বিনত হয়ে, বিনত হয়ে, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু চিত্ত হয়ে, সকল ব্যক্তিকে সম্মান করে সর্বদা কৃষ্ণনাম করতে হয়। প্রচলিত বৈষ্ণববিনয় শব্দবন্ধটি এই শ্লোক সাপেক্ষেই গড়ে উঠেছে।)

২. ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

(এই শ্লোকটিতে নিষ্কারণ ভক্তির কথা বলা হয়েছে। হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরীসান্নিধ্য, কবিতা—এ সব চাই না। জন্মে জন্মে আমার ঈশ্বরে নিষ্কারণ ভক্তি হোক। চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গভূমে দেবপূজা ছিল উদ্দেশ্যমূলক। ভক্ত কাম্য কিছুর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভক্তিধর্মে হেতুহীন ভক্তির কথা প্রচার করেন।)

৩. নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ
কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।

(এই শ্লোকটিও নিষ্কারণ ভক্তিধর্মের প্রকাশক। ভক্ত ও ভগবানের ব্যক্তি সম্পর্ক এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। আপনার নামগ্রহণ কালে কবে আমার দুই নয়ন অশ্রুবর্ষণ করবে, বদন গদগদস্বরে রুদ্ধ হবে, পুলকিত শরীর রোমাঞ্চিত হবে ?)

এই শ্লোক তিনটি পড়লে চৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

ক. চৈতন্যদেব কোনো আচার-অনুষ্ঠানকে মান্য করেননি। মানুষের সাধারণ আবেগকে উপাসনা বা ধর্মাচরণবৃত্তির অবলম্বন করে তুলেছিলেন।

খ. আবেগের সহজ প্রকাশ ধর্ম এবং ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক হেতুহীন। ফলে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করা সম্ভব হয়েছিল। প্রচলিত ধর্মে দেবতা বা দেবীর কাছে কিছু কামনা করা হয়, এবং কামনামাফিক ভক্ত বিপুল পুজোর আয়োজন করেন। এই দেওয়া-নেওয়ার চক্র থেকে চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তিধর্মকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে বিষয়টি এত সহজ ছিল না। তাঁর অনুগামীবৃন্দ বিভিন্ন শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত হয়ে গেলেন। বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ আসলে অনেক ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবীয় দল-উপদলের মতাদর্শ বহন করছে। যে গোষ্ঠী চৈতন্যদেবকে যেভাবে দেখছেন জীবনীতে সেভাবেই তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গাল' গৌরনাগরবাদের প্রচারক, এই নাগরবাদ চৈতন্যচরিতামৃত' নেই। সুতরাং একথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গো জীবনীগুলিতে প্রকাশিত অবতার মূর্তির পার্থক্য আছে। আবার এই অবতারীকরণ হয়েছে বলে ইতিহাসের কোনো উপাদানই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা ঠিক নয়। যেমন চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী ও চৈতন্যদেব সমকালীন নবদ্বীপের আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল তার অনেকটাই চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়।

চৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা জীবনীসাহিত্যকে ভাষার বিচারে আমরা দুশ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। ক. সংস্কৃত জীবনীসাহিত্য খ. বাংলা জীবনীসাহিত্য। প্রধান প্রধান রচনার তালিকা প্রদান করা হল। প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আনুমানিক রচনাকাল দেওয়া আছে।

সংস্কৃত জীবনীসাহিত্য	বাংলা জীবনীসাহিত্য
মুরারি গুপ্তের কড়চা	বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' (১৫৪০-১৫৫০খ্রি.)
কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক (১৫৭৭ খ্রি.)	লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গাল' (১৫৫০-১৫৬৬ খ্রি.)
কবি কর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য (১৫৪২-১৫৪৩ খ্রি.)	জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গাল' (১৫৬০ খ্রি.)
স্বরূপ দামোদরের কড়চা	চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গা বিজয়' (১৫৫০-১৫৬০ খ্রি.)
	কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৬১২-১৬১৫ খ্রি.)

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অংশ বিশেষই বর্তমানে পাঠ্য। কবির নাম কৃষ্ণদাস ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের ভণিতায় কবির নাম পাচ্ছি কৃষ্ণদাস।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

এখানে 'কবিরাজ' নেই। কোনো ভণিতাতেই নেই। নাম-বিচারে ভণিতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এই ভণিতা বিচারেই চণ্ডীমঙ্গালের কবির নাম মুকুন্দ চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম নয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পরে কৃষ্ণদাসের নামের সঙ্গো হয়তো 'কবিরাজ' (কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) যুক্ত হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থ-রচনাকালে তিনি কৃষ্ণদাসই ছিলেন। তাই 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর রচনাকারকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ না বলাই ভালো।

৩.৩ চৈতন্যচরিতামৃত-এর গঠন

সুকুমার সেন তাঁর সম্পাদিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় 'চৈতন্যচরিতামৃত মঙ্গাল-পাঞ্চালিকা নয়। এটি গেয় রচনা মোটেই নয়—পাঠ্য বই, স্থানে স্থানে দুষ্পাঠ্য। পড়ে বোঝাবার জন্য, ভাববার জন্য আনন্দ পাবার জন্য লেখা।' শ্রীসেনের এই মত যথার্থ। গঠন ও রচনা কৌশলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কেমন করে বিশিষ্ট হয়ে উঠল তা ব্যাখ্যা করার আগে এই জীবনীকাব্যের গঠন সম্পর্কে সাধারণ কয়েকটি তথ্য স্মরণে রাখা দরকার।

'চৈতন্যচরিতামৃত' তিনখণ্ডে বিভক্ত—আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে ১৭টি, মধ্যখণ্ডে ২৫টি, এবং অন্ত্যখণ্ডে ২০টি পরিচ্ছেদ আছে। জীবনীকাব্যটি মুখ্যত পয়ার বন্ধে লেখা হলেও ত্রিপদী ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনে রচনার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে সংস্কৃত শ্লোক। এই শ্লোকগুলি প্রধানত বিভিন্ন বৈষ্ণব শাস্ত্রখণ্ড থেকে গৃহীত।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার আদিখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে চৈতন্যজীবনকাহিনির বিবরণে তাঁর গ্রন্থ শুরু করেননি। কতগুলি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। লোচন বা জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গাল' কাব্যের থেকে তাঁর জীবনীগ্রন্থটি যে গোত্রে আলাদা এই শ্লোকবিন্যাসে যেন তা বুঝিয়ে দেওয়া হল। এই শ্লোকগুলির অন্তর্গত ভাবসমূহকে পরবর্তী

অধ্যায়ে ঘটনার মাধ্যমে বিস্তার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণদাসের কাছে ঘটনা মুখ্য নয়। ঘটনা যে ভাবের প্রতিপাদক সেই ভাবই মুখ্য।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে কৃষ্ণদাস লিখেছেন :

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেবাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুনাং তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্লোকটি কৃষ্ণদাসের নিজস্ব রচনা নয়—স্বরূপদামোদরের কড়চা থেকে গৃহীত। অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রেই অগ্রজ বৈষ্ণবদের শ্লোক গ্রহণ করে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার তাঁর গ্রন্থকে যেন এক ঐতিহ্যের কেন্দ্রে স্থাপন করছেন। তাহলে তাঁর স্বকীয়তা কোথায় ? স্বকীয়তা বিন্যাসে। 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণস্বরূপের কথা প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হল। ভক্তপাঠক এরপর যখন গ্রন্থপাঠ করবেন তখন খেয়াল করবেন চৈতন্য রায় রামানন্দকে রসরাজ-মহাভাব মূর্তি দেখাচ্ছেন। তাঁর বুঝতে অসুবিধে হবে না প্রথম পরিচ্ছেদে যে শ্লোক উচ্চারণ করা হল এই ঘটনার বিবরণে তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এভাবেই তত্ত্ব ও তথ্যের পরিপূরক বিন্যাসে গোটা 'চৈতন্যচরিতামৃত' নির্মিত। এই নির্মাণেই তাঁর কৃতিত্ব। পাঠ্য অধ্যায়দুটি ও প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত নানা শ্লোকের ঘটনাগত বা ভাবগত প্রমাণ বহন করছে। এদিক থেকে গ্রন্থটির মধ্যে নিপুণ সংলগ্নতা রয়েছে। কোনো ঘটনাকেই আমরা স্খলিত অপ্রয়োজনীয় বলতে পারব না। আবার শ্লোকের সিদ্ধান্ত যখন ঘটনা সহায়ে প্রমাণ করা হচ্ছে তখন কিন্তু ঘটনার পরিবেশের ক্রিয়ার চমৎকার নাটকীয় বর্ণনা করেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' কার। এদিক থেকে তিনি যথার্থ শিল্পী—কাব্যরসিক।

৩.২.১ আদিলীলা (৪র্থ) ও মধ্যলীলার (৮ম) পরিচ্ছেদের অংশ

আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস মুখ্যত তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন :

ক. চৈতন্যদেবের স্বরূপ

খ. চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ

গ. শক্তিতত্ত্ব বা রাধাতত্ত্ব

বিষয়গুলির পরস্পর পরিপূরক। আমরা একে একে বর্ণনা করব।

ক. চৈতন্যদেবের স্বরূপ

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার তাঁর গ্রন্থের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুযায়ী চৈতন্যদেবের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। শ্লোকটির সরল বঙ্গার্থ হল ঃ শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার স্বরূপা, অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ কারণে) তাঁর একাত্মা, কিন্তু একাত্মা হয়েও অনাদিকাল থেকে তাঁরা গোলাকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। কলিযুগে সেই দুই দেহ একত্বপ্রাপ্ত হয়ে চৈতন্যনামে প্রকটিত। এই রাধাভাবকান্তি যুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকে নমস্কার করি। কৃষ্ণদাসের ভাষায়—'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি/অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥/সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি/ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥' কোন ভাব আস্বাদন করতে চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ এক রূপ ধারণ করলেন ? কবিরাজ গোস্বামী আবার স্বরূপ দামোদরকে স্মরণ করে জানাচ্ছেন তিনটি সাধ পূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকৃত করে চৈতন্যরূপে জন্ম নিয়েছেন। রাধাপ্রেমের মহিমা কেমন, এই প্রেমের আলোকে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের চমৎকারিত্বই বা কতখানি এবং সেই চমৎকারিতা অনুভবে রাধার আনন্দ কতখানি এই তিনটি বিষয় জানার জন্যই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ চৈতন্য-শরীরে আবির্ভূত।

এই তত্ত্বকে ঘটনাগতভাবে কৃষ্ণদাস সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে। সেখানে রায় রামানন্দকে চৈতন্যদেব তাঁর স্বরূপ দেখিয়েছেন।

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।।

কৃষ্ণদাসের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে একথা গোপন রাখতে বলেছিলেন। রায় রামানন্দ একথা গোপন রেখেছিলেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না তবে স্বরূপ দামোদর একথা জানতেন। তাঁর কড়চার সূত্রে কৃষ্ণদাস একথা জানতে পেরে ভক্ত বৈষ্ণবদের জানাচ্ছেন।

লক্ষণীয় যে অষ্টম পরিচ্ছেদেই সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। রায় রামানন্দ রাধা-প্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলেছেন। সাধ্য বলতে বোঝায় কোনো সাধনপন্থায় প্রাপ্য পরম ঈপ্সিত বস্তু। এই সাধ্যবস্তুর আলোচনার সূত্রে রায় রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্য ও প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা বলেছেন। প্রেম-বিলাস-বিবর্ত (পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) বলতে বোঝায় প্রেমের পরমদশা—এই মিলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের সাধ্য ক্রিয়া করে। অর্থাৎ উভয়ের রমণ-রমণীত্ব জ্ঞান লুপ্ত হয়।

প্রশ্ন হল 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত ও চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? দেখা যাচ্ছে প্রেমবিলাসবিবর্তের ইঙ্গিতবাহী গান 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' শেষ না হতেই 'প্রেমে প্রভু (চৈতন্যদেব) স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।' রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদনের কারণ কী? কবি কর্ণপূব তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে লিখেছেন এই মুখ আচ্ছাদনের সম্ভাব্য কারণ দুটি। রাধাভাবরূপী চৈতন্যদেব 'আনন্দবৈবশ্যবশতঃ' রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করতে পারেন।

কবি কর্ণপূর দ্বিতীয় যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তা বেশ বিচিত্র। কর্ণপূর জানাচ্ছেন রায় রামানন্দ যে তত্ত্বের কথা বলেছেন তা অত্যন্ত রহস্যময় এবং তা প্রকাশের সময় তখনও হয়নি বলে চৈতন্যদেব রামানন্দের বাক্‌রোধ করছেন।

কর্ণপূরের এই দ্বিতীয় হেতু থেকে রাধাগোবিন্দ নাথের মতো কোনে কোনো বৈষ্ণবতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করেছেন 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের মূর্তরূপই শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গাসুন্দর।[৩] তাঁদের মতে রায় রামানন্দের এই গীত ব্যাখ্যা করলে আমরা চৈতন্যদেবের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারব। রায় গীতটি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন—তাতে অসময়ে চৈতন্যতত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়ত। তাই চৈতন্য রামানন্দের বাক্‌রোধ করলেন।

আমরা রাধাগোবিন্দ নাথের এই ধারণাকে মান্য করি বা না করি একটি বিষয় কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে কৃষ্ণদাস বঙ্গভূমি ও বৃন্দাবনেরর ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চাইছিলেন। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবরা গৌরপারম্যবাদী—গোরা অর্থাৎ চৈতন্যই তাঁদের পরম আরাধ্য। বৃন্দাবনবাসীর কিন্তু রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন। কৃষ্ণদাসের কাব্যে তাই চৈতন্যদেবের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের কল্পনা করা হল।

বঙ্গভূমিতে চৈতন্যদেবকে মূলত কৃষ্ণের সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে। 'চৈতন্যভাগবত'-এ চৈতন্যদেব শুধু কৃষ্ণ নন, তিনি ঐশ্বর্যময় বিষ্ণু যিনি প্রয়োজনে বরাহমূর্তি ধারণ করতে পারেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এর এই ঐশ্বর্যময় মূর্তি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের গৌরনাগর তত্ত্বে মধুরাখ্য হয়ে উঠেছে। গৌর নাগর তত্ত্ব অনুযায়ী গৌরাঙ্গ নাগর কৃষ্ণের মতো বিলাসপটু। রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী চৈতন্যের ঐশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বারাণসীর প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যকে কৃষ্ণের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত 'বিরুদ স্তোত্র'-তে চৈতন্যকে পরমেশ্বর রূপে এবং ব্রহ্মা ও শিবের অভিশ্রাবকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবতার

---

৩. *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, রাধাগোবিন্দ নাথ, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার।*

গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটির মধ্যে বিভিন্ন প্রবণতা কাজ করে যায়। এই প্রবণতা কারণ নিরপেক্ষ নয়। ভারতবর্ষের সমকালীন ভক্তি আন্দোলনের বৃত্তান্ত খেয়াল করলে দেখা যাবে নায়িকাভাবে সাধনার ধারা নতুন কিছু নয়। নীলাচলে থাকাকালীন চৈতন্যদেব যেভাবে ভক্তিতন্ময় চিত্তে দিন যাপন করতেন তাতে তাঁকে রাধাভাবে ভাবিতা মনে হতেই পারে। বঙ্গভূমির চৈতন্যমূর্তি কিন্তু এমন কৃষ্ণ-তন্ময় নয়। নবদ্বীপে চৈতন্য শিক্ষাদান করেছেন, সংকীর্তন প্রচার করেছেন, কাজি দলন করেছেন। নরহরি সরকার এই হিংসাত্মক চৈতন্যমূর্তির মধ্যে নাগরমূর্তির ভাবনা যোগ করলেন। ইতিহাসের দিক থেকে বঙ্গভূমি ও নবদ্বীপের চৈতন্যমূতি যেন খানিকটা পৃথক।

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অনুগ্রহ-পুষ্ট কৃষ্ণদাস এই পৃথকতত্বকেই সামঞ্জস্য প্রদান করলেন। চৈতন্যই রাধাকৃষ্ণ একথা প্রচারিত হলে চৈতন্যের গুরুত্ব, নাগরভাব, প্রণয়তন্ময়তা, রাধাকৃষ্ণের সর্বভারতীয়ত্বের আধারে চৈতন্যের সর্বভারতীয়তা—সব দিকই রক্ষা হয়।

অবশ্য রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি কল্পনার পেছনে তন্ত্রের শিবশক্তির যুগনদ্ধমূর্তির প্রভাব আছে। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে archetype আর archetypal image এক নয়। যুগনদ্ধমূর্তি archetype আর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যমূর্তি বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত archetypal image অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে বিশ্বাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যুগনদ্ধতার archetype নির্বাচনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

রাধাকৃষ্ণ এই যুগলের পৌরাণিক ও সাহিত্যিক বাস্তবতাকে (mythical and literary reality) ঐতিহাসিক বাস্তবতা (historical reality) প্রদান করার জন্যই চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ যুগলকে স্থাপন করা হল। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলা শুধু ভাব বৃন্দাবনেই ঘটেনি ইতিহাস-পুরুষ চৈতন্যদেবের জীবনেও ঘটেছিল। আবার রাধাকৃষ্ণলীলাকে ঐতিহাসিক মাত্রা দিতে গিয়ে ইতিহাস-পুরুষ চৈতন্যকে 'mythical figure' করে তোলা হল। অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের এক বিচিত্র প্রতিন্যাস কৃষ্ণদাসের চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে বর্তমান।

খ. চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ :

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ বিষয়টি চৈতন্যস্বরূপ ভাবনার পরিপূরক। সাধারণভাবে কোনো বিশেষ দেশকালে কোনো প্রতিভাবান পুরুষের জন্ম হলে সেই ব্যক্তিটি শুধু সেই দেশ-কালের দ্বারা প্রভাবিত হন না, সেই দেশকালকেও প্রভাবিত করেন। যেমন চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে বৈষ্ণবপরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল। চৈতন্যদেব এই বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের মানুষজনকে তীব্র এক ভক্তি আন্দোলনে যুক্ত করলেন। এখানে দেশকালের ভক্তি দ্বারা চৈতন্য এবং চৈতন্যের ভক্তির দ্বারা দেশকাল প্রভাবিত। ভক্তেরা অবশ্য পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে অবতারের আবির্ভাবের কারণ পূর্বনির্দিষ্ট। চৈতন্যদেব কেন আবির্ভূত হলেন 'চৈতন্যভাগবত' কার বৃন্দাবন দাস তার কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর জীবনীকাব্যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ হিসেবে তিনটি সূত্র নির্দেশিত।

১) বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

ধর্মপরাভয় হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।।
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে।।
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গ অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে।।
কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দ।। (১/২)

২) বৃন্দাবন দাস অন্যত্র লিখেছেন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোক ধন্য।।...
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে।।
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবেশে আপনেই হইলা সাক্ষাৎ।।
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার ভক্তিযোগ ধন্য।। (১/২)

এখানে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ হিসেবে গীতার 'যদা যদাহি ধর্মস্য' শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। অস্যার্থ হল নবদ্বীপে দুর্বিনীত অভক্তের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছিল—এই সব দুষ্টের বিনাশ কারণে চৈতন্য আবির্ভূত হলেন। তিনি একা আসেননি—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্' এসেছেন। তিনি শুধু বিধর্মীদের বিনাশ করবেন না—বিনাশের পদ্ধতিটিও অভিনব। নামসংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি সকলকে প্লাবিত করবেন। এই দুষ্টের বিনাশ ও নামসংকীর্তন প্রচারের সঙ্গে ভক্তিযোগের ভাবনাও যোগ করে দেওয়া হল। ভক্তিযোগ অনুসারে ভক্তের ডাক ভগবান উপেক্ষা করতে পারেন না। অগ্রগণ্য ভক্ত অদ্বৈতের ডাকেই চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছে।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ এই আবির্ভাবের কারণটি অন্যভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সেখানে আবির্ভাবের কারণ দুটি গৌণ ও মুখ্য। গৌণ কারণটি 'চৈতন্যভাগবত'-এর অনুরূপ। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখেছেন :

১) আমারে যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজোঁ এ মোর স্বভাবে।।...
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করএ বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।।
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।।
প্রিয়া যদি মান করি করএ ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন।। (১/৪)

'চৈতন্যভাগবত'-এ অদ্বৈত প্রসঙ্গে যে ভক্তিযোগের কথা ছিল এখানে তা সম্প্রসারিত হল। 'ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধ অনুসরণে এই ভক্তিতত্ত্ববাচন রচিত। এই ভক্তিতত্ত্ববাচনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুখ্য কারণটি যোগ করে দেওয়া হচ্ছে। আবির্ভাবের মুখ্য কারণ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশঃ বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু।।

শ্রীকৃষ্ণ তিনটি জিনিস জানার জন্য রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করলেন—

(i) শ্রীরাধার প্রণয়ের মহত্ত্ব কেমন

(ii) রাধার আস্বাদ্য কৃষ্ণমাধুর্যের স্বরূপ কেমন

(iii) কৃষ্ণ-অনুভবে রাধা কেমন আনন্দ পান

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের বাচন উদ্ধার করেছেন—

এই তিন কৃষ্ণা মোর নলি পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।।
রাধিকার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।। (১/৪)

লক্ষণীয় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুখ্য কারণের মধ্যে রাগমার্গের সাধনাই বড়ো হয়ে উঠেছে। বলা যেতে পারে আবির্ভাবের এই তাত্ত্বিক কারণটি বৃন্দাবনের ভক্তিভাবনার সংযোজন।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ যে অদ্বৈতচার্যের প্রসঙ্গ ছিল 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও তার উল্লেখ আছে তবে মুখ্য হয়ে উঠল কৃষ্ণের রস-আস্বাদন ইচ্ছা। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার কৃষ্ণবাচনে লিখেছেন 'রস আস্বাদিতে আমি (কৃষ্ণ) কৈল অবতার।'

অবশ্য রস-আস্বাদন আবির্ভাবের মুখ্য কারণ হলেও গৌণ কারণ নাম-সংকীর্তন প্রচার। 'অনপির্তচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কালৌ/সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।' বহুযুগ ধরে অপ্রচারিত যে ভক্তিরস তার প্রবর্তনের জন্যই তো চৈতন্যের আবির্ভাব। আর ভক্তিরস প্রচারের অন্যতম উপায় তো নাম-সংকীর্তন।

অর্থাৎ 'চৈতন্যভাগবত'-এ উদ্ধৃত কারণসমূহকে কৃষ্ণদাস অস্বীকার করলেন না। তবে সেগুলিকে গৌণ কারণ বলে নির্দেশ করে মুখ্য কারণ হিসেবে বৃন্দাবনে ভক্তিভাবনাকেই প্রতিষ্ঠা করলেন।

গ. শক্তিতত্ত্ব বা রাধাতত্ত্ব :

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর নানা অংশে শক্তিতত্ত্ব বা রাধাতত্ত্ব সংক্রান্ত বাচন ও সিদ্ধান্ত ছড়িয়ে আছে। আসলে রাধাকৃষ্ণের যুগনদ্ধমূর্তি কল্পনা করতে গেলে রাধাতত্ত্ব না শক্তিতত্ত্বের বিষয়টি উল্লেখের প্রয়োজন। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ ও মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ অনুসারে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করা হল। এই আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই গোপীতত্ত্বের কথা আসবে।

আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই রস চারটির মধ্যে শৃঙ্গারকে রসশ্রেষ্ঠ বলা হল। কারণ :

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়।।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্যাদির গুণ মধুরেতে বৈসে।।
আকাশাদির গুণ যেন পর পরভূক্তে।
এক দুই গণনে হয় পঞ্চ পৃথিবীতে।।
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।।

মধুর রসের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারের গুণ বর্তমান। এই রসের রসিকই কৃষ্ণপ্রাপ্ত হন। রসের ভাগ দ্বিবিধ—পরকীয়া এবং স্বকীয়া। স্বকীয়ার থেকে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ কারণ 'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস পরকীয়া প্রেমে প্রতিকূলতা থাকে বলে রসাধিক্য ঘটে। অবশ্য 'ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস' এই ব্রজ বা নিত্যধামের বধূ পরকীয়াভাবের আলম্বন—'তার মধ্যে শ্রীরাধিকা ভাবের অবধি।' এভাবে শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার। এই প্রমাণ বিষয়টি মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত হয়েছে। সেখানে কাম ও প্রেম দুয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। আ-ন্দ্রিয় প্রীতি হল কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি হল প্রেম। সুতরাং যাঁর মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করে তিনিই শ্রেষ্ঠা। প্রশ্ন হল কার রূপেগুণে কৃষ্ণেন্দ্রিয় পরম প্রীতি লাভ করে ?

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রণেতা একটি ঘটনার উল্লেখ করে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্তে রহে রাধা পাশ।।
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।।
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখি ইহাঁ ব্যাকুল হৈলা হরি।।...
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহো রাধা না পাইঞা।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈঞা।।
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাহণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।। (২/৮)

শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসলীলা করেও কৃষ্ণ তৃপ্ত হননি। রাধা রাসমণ্ডলী পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া মাত্রেই কৃষ্ণ রাধা অন্বেষণে গেলেন।

অবশ্য শুধু ঘটনার বিবৃতিতেই তো রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলে চলবে না তত্ত্বগতভাবেও প্রমাণ করতে হবে। এই তত্ত্বকাঠামো নির্মাণের জন্যই শক্তিতত্ত্বের অবতারণা।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম।।
অন্তরঙ্গা বহিরিঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সভার উপরে।।...
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদবংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি।।...
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান।। (২/৮)

এই অংশটি লক্ষ করলে বোঝা যার রাধা হ্লাদিনী শক্তি। সূত্রাকারে এই শক্তিতত্ত্বের ক্রমান্বয়িক/থাকবন্দি বিন্যাসটি তুলে ধরা সম্ভব।

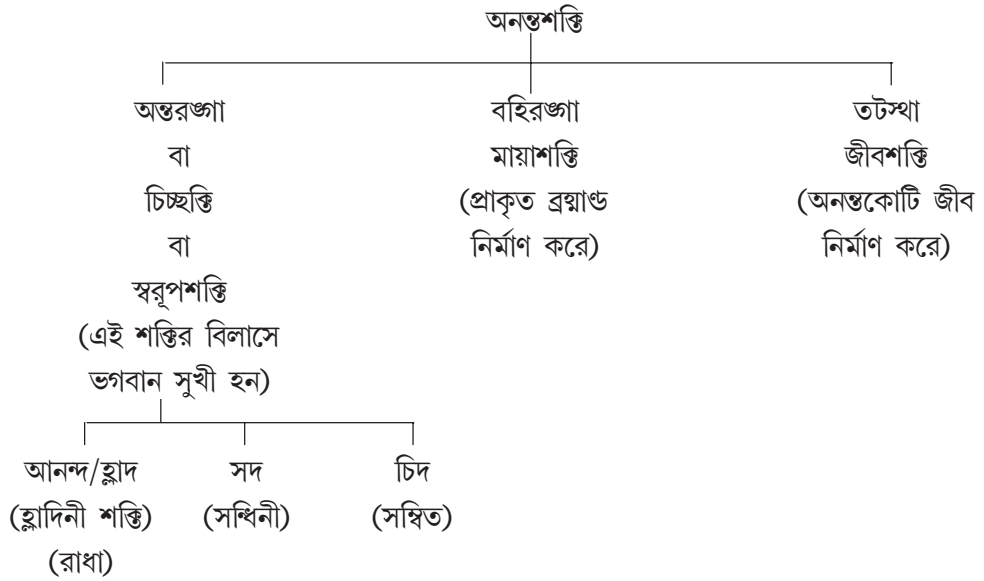

শক্তিতত্ত্বের এই ছকটি লক্ষ করলে দেখা যাবে আসলে এটি সৃষ্টিতত্ত্ব। ব্রহ্মাণ্ড ও জীবজগৎ কী কারণে সৃষ্টি হয় তারই যেন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এই সৃষ্টিতত্ত্বের পর ঈশ্বরস্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বরূপশক্তির কথা বলা হল। এই স্বরূপশক্তির সার হ্লাদিনীশক্তি রাধা। রাসনৃত্যের ঘটনায় আগেই রাধার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল এবার শক্তিতত্ত্বের সাহায্যে রাধার প্রাধান্য স্বীকৃত হল।

এখানে অবশ্য গোপীতত্ত্বের বিষয়টিও খেয়াল করতে হবে। কারণ রাধা প্রধানা গোপী।

গোপী শব্দটি এসেছে গুপ্ ধাতু থেকে। অর্থ রক্ষণ করা। যে সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন তাঁরাই গোপী। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশ্য। এই প্রেমে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ গোপীদের প্রেমক্রীড়া আত্মার্তে নয় কৃষ্ণার্থে। গোপীগণের মধ্যে রাধাপ্রেম শ্রেষ্ঠ কারণ তাতেই কৃষ্ণেন্দ্রিয় যথার্থ তৃপ্ত হয়। এজন্য রাধা গোপীশ্রেষ্ঠ। অন্য গোপীরা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ স্বরূপ। কৃষ্ণপ্রেম রাধায় নির্বাপিত হয় সুতরাং অন্য গোপীরা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকারিণী রাধাকে রক্ষা করে পরোক্ষে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিস্বরূপ প্রেমসাধনা করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার তাই লিখেছেন :

> রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
> সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা।।

৩.৩ মধ্যলীলা (৮ম পরিচ্ছেদ)

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধ্যবস্তু হল কোনো ধর্মপন্থার পরম ঈপ্সিত বস্তু আর সাধনপন্থা হল সেই বস্তুলাভের উপায়। সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনা পাশাপাশি এই অংশের ভাষা-ব্যবহার নিয়েও আমরা আলোচনা করব। কারণ বাংলা

ভাষায় 'চরিতামৃত'কার কেমন করে তত্ত্বরূপ প্রকট করছেন তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে ইংরেজপ্রভাব-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত'ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যাতে দার্শনিক চিন্তন প্রকাশিত হয়েছে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থমধ্যে তার স্বীকৃতিও আছে। যথা 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর উপাদানসমূহ সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থমধ্যে তার স্বীকৃতিও আছে। যথা :

১) আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে **মুরারিগুপ্ত** করিলা গ্রথিত।।
প্রভুর যে শেষলীলা **স্বরূপ দামোদর**।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।
এই দুইজনার সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।। (১/১৩)

২) **বৃন্দাবন দাস** প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।। (৩/২০)

এখানেই 'চৈতন্যচরিতামৃত'কারের কৃতিত্ব। অনেন্য সূত্রকে আত্তীকৃত করে সুললিত বাংলায় তিনি চৈতন্যজীবনের তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করতে চেয়েছেন।

৩.৪ সাধ্যসাধন তত্ত্ব

চৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টক স্মরণে রাখলে আমরা খেয়াল করব চৈতন্যদেবকে নিয়ে যে বিশাল তত্ত্ব মঞ্জরী বিস্তার লাভ করেছিল তার সঙ্গে আবেগদীপ্ত সকল শিক্ষাশ্লোকগুলির যেন কোনো যোগ নেই। নামভক্তিবাদী চৈতন্যদেব ঈশ্বরের সঙ্গে যেন এক সহজ ব্যক্তিগত সম্পর্কই স্থাপন করতে চান। বস্তুত পক্ষে আমরা সর্বভারতীয় ভক্তিধর্মান্দোলন যদি স্মরণে রাখি তাহলে দেখব দক্ষিণের আলোয়ার, নয়নসার থেকে শুরু করে উত্তরে মীরা, দাদু, লালদেও—সবাই ভক্তির কেন্দ্রে এক সহজ আবেগকেই স্থাপন করেছেন। চৈতন্যদেবও এর ব্যতিক্রম নন। বিশেষ করে তাঁর দক্ষিণভারত ভ্রমণ, ভক্তিগ্রন্থের উদ্ধার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ইত্যাদি প্রমাণ করে সর্বভারতীয় ভক্তিধর্মের প্রেক্ষাপট তিনি স্মরণে রাখছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই ভক্তিধর্মকে তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করলেন। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রে বার বার উঠে এল রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণদাস এই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের সঙ্গে চৈতন্যতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁর মহাগ্রন্থের মধ্য লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিবৃত করলেন। কৃষ্ণদাস অবশ্য জানাচ্ছেন এই তত্ত্ব তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চার সূত্রে পেয়েছেন। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় রামানন্দ-চৈতন্য মিলন বিবৃত হয়েছিল। সেই মিলনে রায় রামানন্দ সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন, শ্রবণ করেছিলেন চৈতন্যদেব। অবশ্য রামানন্দ জানিয়েছেন তিনি যন্ত্র, চৈতন্যদেব যন্ত্রী। তবে সে যাই হোক স্বরূপ দামোদরের না দেখা কড়চা (এটি পাওয়া যায়নি) নিয়ে তর্ক না তুলে, রায় রামানন্দের ঐতিহাসিকতা ও পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন না করে আমরা প্রথম কৃষ্ণদাস গোস্বামীর রচনা অনুসারে সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিবৃত করব। পরে অবশ্য সেই তত্ত্বের যৌক্তিকতা আমাদের বিচার্য হবে।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার জানাচ্ছেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে 'গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কথোদিনে' এবং প্রভুর 'গোদাবরী দেখি হৈলা যমুনা স্মরণ।/ তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন।।' এই গোদাবরী তীরেই রামানন্দ রায় 'স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়।।" রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য মিলিত হলেন এবং রামানন্দের কাছে তিনি সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব শ্রবণ করলেন। 'প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।' রায় চৈতন্যদেবের কাছে বিবিধ শ্লোক

প্রমাণ সহযোগে স্তর-পরম্পরায় সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিবৃত করলেন। চৈতন্যদেব ক্রমে প্রশ্ন করে রামানন্দকে মূলে উপনীত সাহায্য করেছেন।

রায় রামানন্দ প্রথমে যথাক্রমে স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ও জ্ঞানরহিত ভক্তিকে সর্বসাধ্যসার বলেছেন। প্রতিক্ষেত্রেই চৈতন্যদেব জানিয়েছেন 'এহো বাহ্য আগে কহ আর'। স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ, স্বধর্মত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—প্রতিটিই সেব্য-সেবকত্ব ভাবের অন্তরায় তাই চৈতন্যদেব এগুলিকে 'এহো বাহ্য' বলেছেন। বর্ণাশ্রমধর্মে দেহাবেশ থাকে, কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই কৃষ্ণে কর্ম অর্পণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণে সর্বধর্মত্যাগের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তি থাকে না। আর জ্ঞানমিশ্রাভক্তি বিচারশীল জ্ঞানের প্রভাবে সম্বন্ধভাবের প্রতিকূল। ফলে সার্ষ্টি, সারূপ্য, সার্লোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য পরিত্যাগী বৈষ্ণবের কাছে এগুলির কোনোটিই সর্বসাধ্যসার হতে পারে না।

রায় রামানন্দ এরপর একে একে জ্ঞানশূন্যাভক্তি, প্রেমশক্তি ও দাস্যপ্রেমকে সর্বসাধ্যসার বলেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই চৈতন্যদেব বলেছেন 'এহো হয় আগে কহ আর।' লক্ষণীয় চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী পর্যায়ে রামানন্দ কল্পিত সাধ্য বিষয়গুলিকে বাহ্যজ্ঞানে অস্বীকার করেছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি বললেন, 'এহো হয়' অর্থাৎ এগুলিকে তিনি অস্বীকার করছেন না। সর্বোত্তম সাধ্যবস্তুতে উপনীত হওয়ার প্রাথমিক স্তর বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন। জ্ঞানশূন্যাভক্তিতে ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকে না, প্রেমভক্তিতে সম্বন্ধজ্ঞানের বিকাশ হয় আর দাস্যভক্তিতে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাই চৈতন্যদেব বলেছেন 'এহো হয়'। আসলে প্রেমই পরম পুরুষার্থ, এগুলি সেই পরমপুরুষার্থে উপনীত হওয়ার নিম্নস্তর।

এরপর রামানন্দ একে একে সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেমের কথা বললেন। সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেমের ক্ষেত্রে চৈতন্য বললেন, 'এহোত্তম আগে কহ আর।' দাস্যভাবে ভক্তহৃদয়ে সামান্য সংকোচ থাকতেও পারে কিন্তু সখ্য ও বাৎসল্যে সেই সংকোচ দূরীভূত হয়। ঐশ্বর্যজ্ঞানের লুপ্তিতে সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং কান্তাপ্রেমে সম্বন্ধ প্রেমের স্ফূর্তি হয়। রামানন্দ জানিয়েছেন 'গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে/ শান্ত দাস্য সখ্যাদির গুণ মধুরেতে বসে।' তাই মধুররসাশ্রিত 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' 'ভাগবত' এই কথার স্বীকৃতি রয়েছে—'যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য মাধুর্যের ধূর্য।/ ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাঢ়য়ে মাধুর্য।।' চৈতন্যদেব রামানন্দের এই বিচার শ্রবণ করে বললেন, '...এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।/ কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।।'

অর্থাৎ কান্তাপ্রেমকে আরও বিশেষিত করার অনুরোধ জানালেন চৈতন্যদেব। রায় রামানন্দ জানালেন 'ইহার মধ্যে' রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।' রায় রাধাপ্রেমকে সাধ্য শিরোমণি বললেন কেন ? নিজের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে রায় রামানন্দ এরপর যথাক্রমে 'গীতগোবিন্দ', 'ভাগবত' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'কে ব্যবহার করেছেন। রাধাপ্রেম অন্যাপেক্ষা নয়, কৃষ্ণ রাধার জন্য গোপীদের রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করেন। রাধাকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। 'হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।/... প্রেমে সার মহাভাব জানি।/ সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।' অর্থাৎ কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার এবং মহাভাবস্বরূপিনী রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। স্বভাবতই চৈতন্যদেব এরপর রামানন্দের কাছে 'দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব' শুনতে চেয়েছেন। রায় 'প্রেমবিলাসবিবর্ত'-এর কথা বলেছেন। তখন 'প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়/ তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয়।।'

অর্থাৎ রাধার কান্তাপ্রেমকেই সাধ্যশিরোমণি বলে স্বীকার করতে হবে। রায় রামানন্দ চৈতন্যদেবকে রাধা-কৃষ্ণের বিলাসলীলা শোনাতে গিয়ে 'না সো রমণ না হাম রমণী' পদটি শোনান। এই পদে প্রেমবিলাসবিবর্তের ইঙ্গিত আছে। 'বিবত' শব্দের দুটি অথ ; পরিপক্ব অবস্থা (জীব গোস্বামী) এবং বিপরীত (চক্রবর্তী)। এই দুটি অর্থকেই গ্রহণ করা যায়। প্রেমের পরিপক্ব অবস্থায় বার বার মিলনে ও মিলন-বাসনার অতৃপ্তির ফলে উৎকণ্ঠা জন্মায়। বাস্তব মিলনেও স্বপ্নবৎ উপলব্ধি হয়। এইভাবে প্রেমলীলায় রমণ ও রমণী এই ভেদজ্ঞান শূন্যতায় যে 'বিলাসমাত্রৈবাতন্ময়তা' তাই প্রেমক্রীড়ার পরমাবস্থা।

চৈতন্যদেব এরপর রামানন্দের কাছে সাধনতত্ত্ব বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। 'সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাই পায়।/কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়।।' মনে রাখতে হবে চৈতন্যদেব যে সাধনের প্রসঙ্গ তুললেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী সেই সাধন জীবের। রাধাপ্রেমকে 'সাধ্য বস্তুর অবধি' বলা হয়েছে। রাধাপ্রেম নিত্যসিদ্ধ তা কোনো সাধনের ফল নয়। 'রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি' হলেও তাই রাধাপ্রেমের আনুগত্যময়ী সেবাই জীবের সাধ্য—'রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।' এই সাধ্যবস্তু লাভের জন্য সখীভাবে রাগানুগা মার্গের সাধন করতে হবে। 'রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।/সেই জন পায় ব্রজের নন্দ।।' অর্থাৎ জীবের সাধ্য রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা এবং সখীভাব অঙ্গীকৃত করে এই সাধ্যবস্তু লাভ করতে হবে।

এবার দেখা যাক রায় রামানন্দের এই সাধ্যসাধনতত্ত্বের যৌক্তিক ঘাতসহত্ব কতটা। প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে কৃষ্ণদাস তাঁর রচনায় অঙ্গীকৃত করেছেন। 'ভাগবত' প্রধানা গোপীর কথা থাকলেও রাধার কথা নেই। তাই রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করে রাধার খোঁজে কৃষ্ণের গমনের সমর্থনে কৃষ্ণদাস জয়দেবে 'গীতগোবিন্দ' ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সাহিত্য এখানে প্রমাণ।

প্রেমবিলাস-বিবর্তের ইঙ্গিতবাহী রায় রামানন্দের 'না সো রমণ না হাম রমণী' অনিবার্যভাবে বিদ্যাপতির 'মাধব মাধব সোঙারিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই' পঙ্‌ক্তিটিকে স্মরণ করায়। এমনকী মনে পড়ে যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনর রাধাবিরহ অংশের রাধার রমণ অভিজ্ঞতার কথা। 'যুড়ী রসনে রসনে। কৈল মুখ মধু পানে/রাধা না জাণিল আপণ পর তখনে।' রাধার আপন-পর জ্ঞানলুপ্তির স্বাভাবিক মানবিক অভিজ্ঞতাই প্রেমবিলাসবিবর্তে তত্ত্বরূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ 'রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি' বলে যে প্রেমবিলাসবিবর্তের কথা বলা হল তা অলৌকিক নয়। বস্তুতপক্ষে ভক্তিধর্ম আন্দোলনের ঐতিহ্যে মানব সম্বন্ধকে ভগবান সম্বন্ধে উপমান হিসেবে ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। তবে এখানে এই রাধাপ্রেম জীবের অসাধ্য বলে তর-তম নির্দেশ করা হল। আশ্চর্য কৌতুক এই যে নামধর্ম-প্রচারক চৈতন্যদেব বৈষ্ণবদের মধ্যে অধিকারভেদ করেননি অথচ পরবর্তী তত্ত্বে অধিকার ভেদ করা হল।

আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'গীতা'র 'মোক্ষ-সন্ন্যাসযোগ' অধ্যায়ের ৬৬নং শ্লোক 'সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' শ্লোকটি চৈতন্য স্বীকার করেননি, 'এহো বাহ্য' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আসলে 'গীতা'র ভক্তিবাদ নবম-দশম শতাব্দী নাগাদ দক্ষিণ ভারতে ভাগবতীয় ভক্তিবাদের দ্বারা নতুন রূপ পরিগ্রহ করছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে 'গীতা'র ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণ নয়, 'ভাগবত'-এর মাধুর্যময় কৃষ্ণই আদৃত। 'গীতা'র পরিবর্তে 'ভাগবত'-এর প্রাধান্য লাভ ভক্তিধর্মের ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহাসিক সূত্র। রায় রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের বাচনে এই ঐতিহাসিক সূত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মধ্যখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদটি পরোক্ষে ভারতে ভক্তিধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। তাই এই অংশটি শুধু ভক্তবৈষ্ণবের অবশ্য পাঠ্য নয়, ইতিহাসি-জিজ্ঞাসুরও অবশ্য পাঠ্য।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কারের ভাষা ব্যবহারের মুনশিয়ানাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার বাংলাভাষী শ্রোতা-পাঠকদের কাছে তাঁর কাব্য তুলে ধরছেন। কাব্যটির মূলভাব সংস্কৃতি শাস্ত্র-ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থের মধ্যে বিধৃত। এই মূল গ্রন্থগুলি যাঁদের কাছে অধরা তাঁদের জন্যই কৃষ্ণদাস কাব্য লিখেছেন। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার নিরিখে বলা যায় এ ব্যাপারে তিনি সার্থক। তা ছাড়া তাঁর কাব্যের বহু অংশ শ্রোতাপাঠক স্মৃতিতে স্থায়ী হয়েছে। কালিদাস রায় তাঁর 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' শীর্ষক কবিতাটিতে যথার্থই লিখেছেন ঃ 'ব্রজে মাধুকরী করি বিন্দু বিন্দু মধু হরি মধুচক্র করেছ গঠন,/আনন্দে করিছে পান তোমার স্বর্গীয় দান, গৌরপ্রাণ যত গৌড়জন।'/

৩.৭ সারাংশ

কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'র এই আলোচনা থেকে শেষপর্যন্ত আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি :

১) 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রচলিত বাংলা জীবনীকাব্যগুলির থেকে গঠনে পৃথক। মঙ্গালকাব্যের গেয় বা পরিবেশনযোগ্য ভঙ্গি এখানে নেই, আছে যথার্থ দার্শনিক গ্রন্থের গাম্ভীর্য।

২) কৃষ্ণদাস ব্রজমণ্ডল ও বঙ্গাভূমি—এই দুই দেশের কৃষ্ণভাবনার বা চৈতন্যভাবনার মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিলেন। তবে ব্রজমণ্ডলের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল।

৩) কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের গোস্বামীতত্ত্বকে অনুসরণ করে চৈতন্যদেবকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণমূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

৪) এই কাব্যে ঘটনার বিন্যাস ভাবাদর্শের অনুসারী। এদিক থেকে এটিকে চৈতন্যজীবনের অন্তরঙ্গাভাষ্যে বলা যায়। অবশ্য এই অন্তরঙ্গা-জীবন গোস্বামীদের কল্প-বিশ্বাস প্রসূত।

৩.৬ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলা চৈতন্য জীবনীসাহিত্যের প্রচলিত গোত্রের থেকে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থটি গোত্রে আলাদা।—আলোচনা করুন।

২. সাধ্য ও সাধন বলতে কী বোঝায় ? 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনা করুন।

৩. 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসারে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করুন।

৪. শক্তিতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. চৈতন্যের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন এবং সে-জীবন কীভাবে 'জীবনী' হয়ে উঠেছিল তা দেখান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. চৈতন্যদেবের জন্ম ও মৃত্যু সাল কত ?

২. দুটি সংস্কৃত চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থের নাম লিখুন।

৩. 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাদে দুটি বাংলা চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থের নাম লিখুন।

৪. রায় রামানন্দ কে ?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. বিমানবিহারী মজুমদার—*চৈতন্যচরিতের উপাদান*

২. রমাকান্ত চক্রবর্তী—*বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*

৩. S. K. De—*Vaisnava Faith and Movement in Bengal*

৪. রাধাগোবিন্দ নাথ—*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*

৫. সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—*কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*

৬. হিতেশরঞ্জন সান্যাল—*বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*